জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
খণ্ড ১৫। সংখ্যা ২
জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫

ISSN 2519-5816
DOI: doi.org/10.3329/jnujarts.v15i2.87976
Page: 40-55

হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাসে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ: ক্রান্তিকালীন পরিপ্রেক্ষিত

ড. নাহিদা বেগম*

Political Context in the Novels of Humayun Ahmed: A Transitional Perspective

Abstract

This study examines the political consciousness embedded in the novels of Humayun Ahmed, focusing on how his fiction reflects and reframes major historical crises in Bangladesh, such as the Partition, the 1971 Liberation War, military regimes, and post-independence disillusionment. Instead of overt political commentary, Ahmed employs subdued realism and psychological nuance to depict the tension between individual lives and state machinery. His characters are often caught in moral and ideological conflicts that mirror broader national anxieties, offering readers a deeply humanized lens through which to understand political trauma. The research adopts a qualitative methodology, drawing on contextual and textual analysis to uncover how his narratives function as literary responses to political events. Ultimately, this study argues that Ahmed's fiction serves as a parallel archive of Bangladesh's socio-political history, where memory, resistance, and identity are negotiated through narrative. His work thus demonstrates literature's enduring power to engage with and critique state violence and historical silencing.

মুখ্যশব্দ: ক্রান্তিকাল, রাষ্ট্রচিন্তা, ঐতিহাসিক চেতনা, রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি, সামরিক শাসন

* Dr. Nahida Begum, Associate Professor, Department of Bangla, Comilla University, Cumilla.
nahid.oprotim13@gmail.com

বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২)। তাঁর উপন্যাসে ব্যক্তিগত জীবনাভিজ্ঞতা, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা এবং সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনাচারের পাশাপাশি জাতির ইতিহাসের ক্রান্তিকালীন মুহূর্ত—দেশভাগের সাম্প্রদায়িক বিভাজন, সামরিক শাসনের অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়, মুক্তিযুদ্ধের বেদনাময় সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা-উত্তর নতুন দেশের রাজনৈতিক বৈকল্য, ভ্রান্তি ও ব্যর্থতার মতো সংবেদনশীল প্রসঙ্গের গভীর মানবিক চিত্রায়ণ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা সরাসরি কোনো দলীয় অবস্থানে দৃশ্যমান না হলেও তাঁর সাহিত্যিক অবস্থান এমন এক নিরপেক্ষতার পক্ষে, যা নিপীড়ক, দুর্বিনীত রাষ্ট্র-ক্ষমতা ও ইতিহাসবিকৃতির বিরুদ্ধে ন্যায়সংগত প্রতিবাদের ভাষ্য গড়ে তোলে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাসসমূহকে একটি প্রগাঢ় রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ, যেখানে ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও ইতিহাস পরস্পর সম্পৃক্ত হয়ে হুমায়ূনপাঠের প্রচলিত ধারাকে অতিক্রম করবে। আর এই উদ্দেশ্য সাধনে গুণগত পদ্ধতির অনুসরণে নির্বাচিত উপন্যাসসমূহের পাঠ বিশ্লেষণ, প্রাসঙ্গিক আর্থ-সামাজিক-ঐতিহাসিক পটভূমি ও সাহিত্যতাত্ত্বিক সূত্রাবলির সহায়তা নেওয়া হয়েছে, যাতে করে লেখকের অন্তর্জাত রাজনৈতিক চেতনার অভিন্ন রেখাটি স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়।

রাজনীতি: জীবন ও সাহিত্যে

সাধারণভাবে রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করা হয় রাষ্ট্রশাসন বা পরিচালনার নীতি হিসেবে যা রাষ্ট্র, জনগণ ও সার্বভৌমত্ব প্রভৃতি বিষয়াদি পরিচালনা ও সংরক্ষণের একমাত্র চলক। মূলত,

> রাষ্ট্রের সহিত তথা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের সহিত সম্পর্কযুক্ত সকল প্রতিষ্ঠান ও কার্যই 'রাজনৈতিক' হিসেবে পরিগণিত হয়। রাজনৈতিক দল, রাজনীতিক নির্বাচকমণ্ডলী, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ইত্যাদির সকল কার্যকলাপই 'রাজনীতি'র অন্তর্ভুক্ত।[১]

অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই মানুষ রাজনৈতিক চেতনাকে ধারণ করে। আমেরিকান লেখক Robert A. Dahl-এর বক্তব্যেও অনুরূপ ধারণা পাওয়া যায়:

> Nonetheless, though human being must and do live in political system and share the benefits of political life; they do not necessarily interested in politics, nor do they always care what happens in politics; know much about political events or share in making decisions.[২]

ব্যক্তি ও সমাজ যেমন রাজনীতির উর্ধ্বে নয়, তেমনি বিচ্ছিন্ন নয় সাহিত্যক্ষেত্রও। দেশভাগের পর থেকেই বাংলাদেশের উপন্যাসের আশ্রয় ছিল পূর্ববঙ্গের জীবন ও রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন। বাঙালির প্রতিবাদ, ক্ষরণ, যন্ত্রণা ও প্রাপ্তির মতো সমস্ত বিপর্যয় ও অর্জনের প্রতিফলন ঘটেছে বাংলাদেশের উপন্যাসে। এমনকি এদেশের বহুধা বিভক্ত রাজনৈতিক মতধারা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার শাসন পদ্ধতিগুলোর কার্য-নির্বাহী কাঠামোরও পরিচয় মেলে বাংলাদেশের উপন্যাসে। এই পরিমণ্ডলের বাইরে নয় হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাসসমূহ। নগরজীবন-অন্তরালবর্তী মানুষের রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলোর চিত্রায়ণে তিনি জনমানুষের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যবহার করেছেন জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে। ফলে রাজনৈতিক পটভূমি তাঁর উপন্যাসের মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠেনি, বরং বিশেষ বিশেষ সময়ের ক্রান্তি পরিবেশনের আশ্রয় হয়ে উঠেছে। হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাসে প্রতিফলিত ক্রান্তিকালীন রাজনৈতিক প্রসঙ্গকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করে উপস্থাপন করা হলো।

বিভাগ-পূর্ব সময়ের ক্রান্তি: ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রশক্তি ও বিভাজনের রাজনীতি

ভারতবর্ষীয় রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫)। বঙ্গভঙ্গ উদ্ভূত রাজনৈতিক চেতনা আমূল বদলে দিয়েছে বাংলার জনমানুষের জীবন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন ব্যবস্থার প্রথম দিকে লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভূমির রাজস্বনীতি আইন ও মেকলের প্রবর্তিত আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা কোনোটাই মুসলমান সম্প্রদায়ের মনঃপূত না হওয়ায় ব্রিটিশদের প্রিয়ভাজন হয় ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়। আবার কিছুকাল পরে ভারত শোষণের প্রশ্নে হিন্দু সম্প্রদায় প্রতিবাদমুখর হলে এর প্রতিক্রিয়ায় ব্রিটিশদের সম্পর্কের গতি প্রবাহিত হয় মুসলিমপ্রীতির দিকে। মূলত,

> এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে ব্রিটিশরা তাদের চিহ্নিত ভারতীয় সমাজের 'সহজাত নেতৃবৃন্দে'র স্বার্থের সাথে এক প্রকার সখ্য গড়ে তোলে যাতে একজনের বিরুদ্ধে অন্যকে ব্যবহারের মাধ্যমে ভারসাম্য বজায় রাখা যায় এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে নিশ্চিত করে সবাইকে অধীন রাখা যায়।[৩]

শুরু থেকেই ব্রিটিশ রাজশক্তির নৈকট্যের সঙ্গে জাতিগত লাভ-ক্ষতির সম্পর্ক জড়িত বলে উভয় সম্প্রদায়ই ব্রিটিশদের সঙ্গে সম্পর্ক বিচার করে নিজেরা নিজেদের শত্রু হয়ে উঠেছে। ঐতিহাসিকদের মতে, ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনামলের পূর্বে সাম্প্রদায়িকতা ছিল, তবে তা সীমাবদ্ধ ছিল নিতান্তই সামাজিক গণ্ডিতে। কিন্তু '১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতা এক ভয়াবহ ব্যাধিরূপ ধারণ করে।'[৪] হুমায়ূন আহমেদের *মধ্যাহ্ন* উপন্যাসে বঙ্গভঙ্গ ও তার পরবর্তী ফলাফলজাত সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়ায় স্বদেশি আন্দোলন, দ্বিজাতিতত্ত্ব আন্দোলন ও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের যে খণ্ড চিত্র পাওয়া যায় সেখানে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির সাক্ষ্য মেলে। এ উপন্যাসে ধনু শেখ মুসলিম লীগের নেতা। তাকে জিন্নাহপন্থি পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থকরূপে স্বরাজ আন্দোলনের কর্মীদের পুলিশদের কাছে ধরিয়ে দিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃক প্রাপ্ত 'খান বাহাদুর' উপাধি পেতে দেখা যায়। তাদের প্রতি ধনু শেখের বিদ্বেষপ্রসূত উক্তি:

> বদগুলো স্বরাজ স্বরাজ করতাছে। স্বরাজ আসুক, পিটায়া লাশ বানাব। ইংরাজ পুলিশের ভয়ে এখন কিছু করতে পারতাছি না। হিসাব মতো হিন্দুস্থানের মালিক আমরা। দিল্লির সিংহাসন ছিল আমাদের। যদি স্বরাজ হয়, হিন্দুস্থানের নাম বদলায়া করব মুসলমান স্থান।[৫]

দেশ বিভাজনের সামাজিক প্রেক্ষাপটে রচিত শহীদুল্লা কায়সারের (১৯২৭-১৯৭১) *সংশপ্তক* (১৯৬৫) উপন্যাসে পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক ও মুসলিম লীগপন্থি জাহেদের বক্তব্যের মধ্যেও ধনু শেখের মতো এরূপ স্বরাজ-বিরোধী মনোভাব প্রতীয়মান হয়। রাজনৈতিক পক্ষ সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে জাহেদ সেকান্দর মাস্টারকে বলে, 'স্বরাজ মানে তো হিন্দুস্থান। ওতে মুসলমানদের কি হবে? প্রায় দুশো বছর তো ইংরেজের গুঁতো খেয়ে কাটল। স্বরাজ এলে পর শুরু হবে বেনে মুৎসুদ্দির গুঁতো।'[৬]

দেশভাগের কিছু পূর্ব সময়ে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধারণা প্রোথিত ছিল যে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে অঞ্চলসমূহ হিন্দুস্তান বা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। ফলে মানুষের মধ্যে দেশ দখলকে কেন্দ্র করে তীব্র ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি হয়। যার বলি হতে হয় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে সাধারণ মানুষকে। *মধ্যাহ্ন* উপন্যাসে হিন্দু-অধ্যুষিত ও

সংখ্যাগরিষ্ঠ বান্ধবপুরে মুসলিম রাজত্ব কায়েম করার জন্য ধনু শেখ মসজিদে আগুন লাগিয়ে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেন। মুসলিম লীগের একজন ক্ষমতাধর রাজনৈতিক নেতা হিসেবে এ কাজকে তিনি রাজনৈতিক দায় হিসেবেই গণ্য করেন এবং নির্বিচারে এমন মানুষ হত্যায় তার বিবেকের কোনোরূপ পীড়ন লক্ষ করা যায় না। অথচ ইতিহাস বলে 'সীমানা নির্ধারণ করিতে গিয়া ইহার চেয়ারম্যান স্যার র‍্যাডক্লিফ অন্যায়ভাবে মুসলিম অধ্যুষিত কয়েকটি এলাকা হিন্দুস্তানের সঙ্গে জুড়িয়া দেন।'[৭] যার ফলে *মধ্যাহ্ন* উপন্যাসে ধনু শেখদের মতো মানুষেরা ভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়ে পড়লে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক অমীমাংসিতই রয়ে যায়।

বিভাগোত্তর সময়ের ক্রান্তি: আধা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও সামরিক শাসনের রাজনীতি

রাজনীতিতে রাষ্ট্রের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সব সময়ই দোদুল্যমান। রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামপ্রবণ সম্পর্ক ও ক্ষমতার উচ্ছিষ্টভোগী উভয় প্রকৃতির চরিত্রের প্রকাশ দেখা যায় হুমায়ূন আহমেদের ১৯৪৭-১৯৭১ কালপর্বের রাজনৈতিক ঘটনাবলি নিয়ে রচিত উপন্যাসে। এই সময়পর্ব সম্পর্কে আহমদ শরীফ বলেন:

> আমাদের সঙ্কট-সমস্যার, সংহতির, সংগ্রামের ও বিজয়ের চারটি স্তম্ভ, চারটি বীকন রশ্মি, চারটি মীনার। এক বায়ান্ন'র ভাষা সংগ্রাম, দুই বাষট্টির শিক্ষাদ্রোহ, তিন ঊনসত্তরের অভ্যুত্থান এবং চার একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ।[৮]

বিভাগোত্তর সময়ের বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে হুমায়ূন আহমেদের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুবাদে গোটা ষাটের দশকের উত্তাল রাজনীতির গতি-প্রকৃতির সঙ্গে ছিল তাঁর একাত্ম যোগ। পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক শাসকের আগমন, শেখ মুজিবের রাজনৈতিক কর্মসূচি, মোনায়েম খানের পূর্ববঙ্গ শাসন, মুসলিম লীগের জাতিরাষ্ট্রকে কূটকৌশলে ধর্মরাষ্ট্রে রূপদান ও বামপন্থিদের আন্দোলনসমূহ তাঁর উপন্যাসে প্রাসঙ্গিক বিষয় হয়েই এসেছে।

ষাটের দশকে আইয়ুব সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত এনএসএফ (NSF-National Students Fedaration) বাহিনীর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, ধর্ষণ, অত্যাচার, নির্যাতন ও নিপীড়নে তৎকালীন নাগরিক মানুষের জীবন হয়ে পড়েছিল দুর্বিষহ। *মাতাল হাওয়া* উপন্যাসে এনএসএফ সম্পর্কে হুমায়ূন আহমেদ উল্লেখ করেন: 'এনএসএফের প্রধান এবং একমাত্র কাজ সরকারি ছাতার নিচে থেকে গুণ্ডামি করা। সরকার এদের ওপর খুশি। কারণ এদের কারণে অন্য ছাত্রসংগঠনগুলি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না।'[৯] তিনি তাঁর আত্মজীবনীতেও এনএসএফের গুণ্ডাবাহিনীর নিপীড়ন সম্পর্কে বলেছেন:

> মহসিন হলের ৫৬৪ নম্বর রুমে রসায়ন বিভাগের অতি নিরীহ একজন ছাত্র বাস করত। [...] একদিন কোনো কারণ ছাড়াই এনএসএফের নেতারা তার ঘরে ঢুকে রুম তছনছ করে দিল। তোষক জ্বালিয়ে দিল এবং বেচারার নিজের টাকায় কেনা Organic Chemistry-র Morrison and Boyed-এর লেখা বিশাল বইটাও ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলল। তার একটাই বই। কেমেস্ট্রির অন্য বইগুলি সে লাইব্রেরি থেকে এনে পড়ত। নতুন করে আরেকটা তোষক কেনার টাকা তার ছিল না। খাটে পত্রিকার কাগজ বিছিয়ে ঘুমানো ছাড়া তার কোনো পথ রইল না। গোবেচারা এই ছাত্রের নাম হুমায়ূন আহমেদ।[১০]

হুমায়ূন আহমেদের সমকালীন অন্যান্য ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়ও রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় থেকে এনএসএফ বাহিনী দ্বারা সংঘটিত অপরাধকর্মের বর্ণনা পাওয়া যায়। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৬) উপন্যাস থেকে এনএসএফের গুণ্ডাদের দ্বারা ধর্ষিত হওয়ার পরও সম্ভ্রম ও নিরাপত্তা হারানোর ভয়ে কাতর এক পথচারির বিচার না চাওয়ার প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা যায়:

> চলেন স্যার, থানায় যাই গিয়া, নীলক্ষেত ফাঁড়িতো কাছেই। লোকটি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। খিজির ফের বলে, 'অহনও টাইম আছে, থানায় চলেন। লোকটি ফোঁপাতে ফোঁপাতে জবাব দেয়, 'এদের চেনো? এরা এনএসএফের গুণ্ডা, আইয়ুব মোনেম খানের বাস্টার্ড এরা।[১১]

আইয়ুব সরকারের সামরিক আইন প্রবর্তন, রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা, গণতন্ত্রের নামে স্বৈরাচার ও একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি মানুষের জীবনে যে প্রভাব সৃষ্টি করে, তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিবেকপ্রবণ মানুষের মনে ক্ষোভ ও দ্রোহ পুঞ্জীভূত হয়। ফলে 'ঢাকাতে আইয়ুবের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ আন্দোলন হয়, যার পুরোভাগে ছিল ছাত্রসমাজ।'[১২] পরবর্তী সময় আইয়ুব বিরোধী চেতনা শুধু ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। পাশাপাশি বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক মহলেও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয় সোচ্চার প্রতিবাদ। হুমায়ূন আহমেদের *মাতাল হাওয়া* উপন্যাসে আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আবদুল হামিদ ও আসাদকে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারানোর প্রসঙ্গ উল্লেখ রয়েছে। এ উপন্যাসে উদ্ধৃত কবি শামসুর রাহমানের বিখ্যাত কবিতা 'আসাদের শার্ট' যেন আসাদের মহান মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের চেতনাজাগরণের মন্ত্র হয়ে উঠেছে:

> আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা
> সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক:
> আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।[১৩]

অচিরেই জনমানুষের বিপ্লব সফল হয় ও পতনের স্বাদ পায় রাহুরূপী পরাক্রমশালী আইয়ুব সরকার।

যুদ্ধকালীন ক্রান্তি: দমন, পীড়ন ও বিরুদ্ধ প্রতিরোধের রাজনীতি

উনসত্তরে গণ অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে যে চেতনাগত উত্তরণ; যে স্বাধিকার প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়েছিল, তা আপাত পরিসমাপ্তিতে পৌঁছায় ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে মিত্রবাহিনীর প্রধান জেনারেল অরোরার কাছে জেনারেল নিয়াজির আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে। সংকটকালীন পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় ১৯৭১ সালে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যুদ্ধকালীন রক্ত, হত্যা, ধ্বংসের আয়োজন সময়ের সব শিল্পীসত্তার মতো হুমায়ূন আহমেদের চৈতন্যেও প্রগাঢ় অনুভূতির জন্ম দিয়েছে। যার প্রভাব ফুটে উঠেছে তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসসমূহে। *নির্বাসন* (১৯৭৪), *শ্যামল ছায়া* (১৯৭৪), *সৌরভ* (১৯৭৪), *১৯৭১* (১৯৮৬), *আগুনের পরশমণি* (১৯৮৬), *সূর্যের দিন* (১৯৮৬), *অনিল বাগচীর একদিন* (১৯৯২) এবং *জোছনা ও জননীর গল্প* (২০০৪) —এই উপন্যাসগুলোতে যুদ্ধকালীন বাস্তবতায় সময়ের সংকট ও প্রতিরোধের চিত্র উপস্থাপনের প্রয়াস রয়েছে।

বাংলাদেশে যুদ্ধের অভিঘাত পাকিস্তানিদের পক্ষ থেকে শুরু হয় ২৫ মার্চ 'অপারেশন সার্চলাইট' নামক ঢাকা আক্রমণের মধ্য দিয়ে। ২৫শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী, পিলখানার ইপিআর রাইফেলসের বহু সেনা এবং রাজারবাগ পুলিশলাইনের বহু পুলিশসহ মানুষের একটা বিশেষ অংশ এই আক্রমণের শিকার হয়। *জোছনা ও জননীর গল্প* উপন্যাসে ঢাকায় ২৫ মার্চের আক্রমণের বিবরণ দেওয়া আছে এভাবে: 'একদল মিলিটারি ঢুকে পড়ল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। তাদের হাতে শিক্ষকদের তালিকা। তারা মানুষ না, তারা সাক্ষাৎ আজরাইল। মানুষের বেশে জান কবজ করতে এসেছে।'[১৪] এ অতর্কিত হামলায় এক রাতে পাল্টে যায় ঢাকার চিত্র। পাকিস্তানিরা নির্বিচারে হত্যা করে সাধারণ গৃহস্বামী, নারী ও শিশু। নিরস্ত্র বাঙালির প্রতিরোধের সুযোগ নেই জেনেও অন্ধকার ভয়াল পরিবেশে দীর্ঘ সময় অবরুদ্ধ রেখে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় তারা। কারফিউ শিথিল হলে বাঙালি যে নিষ্ঠুর বাস্তবতায় প্রক্ষিপ্ত হয় সেখান থেকেই তাদের ভেতর জাগ্রত হয় হায়েনা বিতাড়নের উদগ্র শক্তি। *জোছনা ও জননীর গল্প* উপন্যাসের চরিত্র নাইমুল লেখক আনোয়ার পাশার (১৯২৮-১৯৭১) *রাইফেল রোটি আওরাত* (১৯৭৩) উপন্যাসের সুদীপ্ত শাহীনের মতো অপারেশন সার্চলাইটের তাণ্ডব দেখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো বিস্ফোরিত হয়। তার কণ্ঠে উচ্চারিত হয় দেশকে শত্রুমুক্ত করার প্রত্যয়। স্ত্রী মরিয়মকে তাই সে বলে, 'পাকিস্তানি মিলিটারিদের সঙ্গে সত্যিকার যুদ্ধ এখন শুরু হবে। কী ভয়াবহ যুদ্ধ যে হবে ওরা বুঝতে পারছে না।'[১৫]

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই বিহারিদের অত্যাচার ঢাকার অধিবাসীদের জন্য ছিল ভীতিকর ও অসহনীয়। বিহারিরা জাতীয়তার দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সমর্থক ছিল। স্বভাবতই বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থানে ঘটা মুক্তিযুদ্ধকে তারা বিজাতীয় ঘৃণার চোখে দেখেছে এবং যুদ্ধ সময়ের পরিস্থিতিকে ব্যবহার করে হত্যা লুটপাট ও বাড়ি দখলের মতো ঘটনা দ্বারা নিজেদের পাকবাহিনীর দোসর প্রমাণের চেষ্টা করেছে। বিহারিদের নির্যাতন প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ:

> মাথার কাছে জানালাটা খুলে দিতেই দেখলাম, সামান্য দূরে একটা ছোট দোকানে আগুন জ্বলছে। কাল রাতে বিহারিরা দোকানে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। মিলিটারিরাই যে বিহারিদের দিয়ে এসব করিয়ে থাকে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।[১৬]

হুমায়ূন আহমেদের *আগুনের পরশমণি* (১৯৮৬) উপন্যাসে ইয়াদ সাহেবের মোহাম্মদপুরের মূল বাড়িটি দখল করে বিহারিরা। দেশ স্বাধীন না হলে বাড়িটি আর ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে একজন নির্বিরোধ মানুষের মতো ইয়াদ সাহেব আক্ষেপ নিয়ে অপেক্ষা করেন স্বাধীনতার। ভাবেন, 'তিনি বেঁচে থাকতে-থাকতে কি দেশ স্বাধীন হবে? ফিরে পাওয়া যাবে নিজের বাড়ি?'[১৭]

স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় ঘোলাটে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মানুষের গোছানো পারিবারিক জীবনে নানারূপ বিপর্যয়ের মধ্যে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি দেখতে পাওয়া যায়। নগরবাসীর মধ্য থেকে হঠাৎ কাউকে নিখোঁজ করে দেওয়ায় বিষয়টি পাকবাহিনী ঘটিয়েছিল মানুষের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য। প্রকৃতই হুমায়ূন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসে দেখা যায়, যুদ্ধসময়ে মানুষের সমগ্র চেতনা আচ্ছন্ন ছিল নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার প্রবল শঙ্কায়। হুমায়ূন আহমেদের ব্যক্তিজীবনেও এই ভীতিকর অনুভূতির অভিজ্ঞতা রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তাকে মহসীন হল থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল।[১৮] তুলে নেওয়া ব্যক্তিদের কেউ কেউ জীবিত ফিরলেও মিলিটারি কর্তৃক হত্যার শিকার হতে হয়েছে অসংখ্য তরুণকে। হুমায়ূন আহমেদের *শ্যামল ছায়া*

উপন্যাসে শরাফত সাহেবের এমএ পড়া ছেলেকে পাকিস্তানি মিলিটারিরা তুলে নিয়ে হত্যা করে। হাসান আলীর বক্তব্যে সে হত্যার বর্ণনা:

> শেষমেষ মিলিটারিরা শরাফত সাহেবের বড়ো পুলাডারে ধইরা আনল। আহা রে, কী কান্দন ছেলের! এখনো চউক্ষে ভাসে। বি. এ পাশ দিয়া এম. এ. পড়ত। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমন আচার ব্যাভার। ভদ্রলোকের ছেলে যেমন হওনের তেমন।[১৯]

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তরুণ সম্প্রদায়ের সঙ্গে আওয়ামী লীগ ও সংখ্যালঘু হিন্দুরা পাকবাহিনীর রোষানলে পড়ে। এই দুই পক্ষের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের বৈরী সম্পর্ক নতুন ভূখণ্ড সৃষ্টির সময়পর্ব থেকেই। সাতচল্লিশে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রচেষ্টায় বাংলা ভাগ হলেও হিন্দুস্তানের বাঙালির সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালির নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক দেখা যায়। পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের বিবাদের জন্য বাংলাভাষী হিন্দু সম্প্রদায়কেই দায়ী মনে করে পাকিস্তানপন্থিরা। এ সম্পর্কে প্রাবন্ধিক স্বদেশ রায় বলেন, 'ঐতিহাসিক সত্যতা রক্ষা করতে গেলে সকলেই স্বীকার করবেন, মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণের পাশাপাশি হিন্দু সম্প্রদায় বেশি এবং বিশেষ নির্যাতনের শিকার হয়েছে।'[২০] একারণে যুদ্ধের ক্রান্তিকালে রাস্তায় চলাকালীন সাধারণ পথচারীকে কখনো কখনো যৌনাঙ্গের খতনা প্রদর্শন করে ধর্মীয় পরিচয় নিশ্চিত করতে হতো। অন্যদিকে শুরু থেকেই শেখ মুজিবের প্রাদেশিক স্বাধীনতার জন্য লড়াই পশ্চিম পাকিস্তানিদের কাছে দেশদ্রোহ বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ফলে আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবুর রহমানকে মুসলিম লীগপন্থিরা জাতশত্রু হিসেবে বিবেচনা করেছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন যেকোনো মানুষকে পেলেই গুলি করার কারণ হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানের 'জি-২ অপারেশন, নবম ডিভিশন, কুমিল্লা'-এর দায়িত্বে থাকা মেজর রাঠোর সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাসকেও অনুরূপ বক্তব্য দিয়েছেন। একজন বাঙালিকে হত্যার কারণ হিসেবে তিনি বলেন, 'কারণ লোকটা হিন্দু হতে পারে, দেশদ্রোহী হতে পারে, সম্ভবত ছাত্র বা আওয়ামী লীগের কর্মী। [...] আপনাকে কি আমার মনে করিয়ে দিতে হবে যে তারা কীভাবে পাকিস্তান ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে?'[২১] হুমায়ূন আহমেদের *অনিল বাগচীর একদিন* (১৯৯২) উপন্যাসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও অনিলের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানিদের এই মনোভাব স্পষ্ট হয়েছে:

> ক্যাপ্টেনের চোখে মুখে খানিকটা উৎসাহ ফিরে এসেছে। সে অনিলের কাছে উঠে এল। ইংরেজিতে বলল,
>
> 'তুমি হিন্দু?'
>
> অনিল বলল, 'ইয়েস স্যার।'
>
> 'তুমি মুক্তিবাহিনীর লোক?'
>
> 'না স্যার।'
>
> 'আওয়ামী লীগ?'
>
> 'না।'
>
> 'মুজিবের পা-চাটা কুকুর। মুজিবের পা কখনো চেটে দেখেছ। কেমন লাগে চাটতে?'[২২]

নীতি সর্বস্বতা, মূল্যবোধ—এই শব্দগুলি ব্যক্তি ও পরিস্থিতিভেদে মানুষের ইশতেহারের মতো। মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে পাক-হানাদার বাহিনীর নীতি ও মূল্যবোধের বহুমাত্রিক রূপান্তর দেখা গেছে। মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ গৃহস্থ অনেক নারীকে সম্ভ্রম হারাতে হয়েছে। তাদের কাছে যুদ্ধে হস্তগত হওয়া যেকোনো সম্পদকে 'গনিমতের মাল' বিবেচনা করা যুদ্ধরাজনীতির অংশ। সেই বিবেচনায়

বাঙালি নারীকেও পাকবাহিনী গণ্য করেছে 'গনিমতের মাল' হিসেবে। যদিও নারী-সম্ভ্রমের প্রশ্নে ব্যক্তিগত সংবেদনশীলতা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। এ কারণে তাঁর উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের হত্যাযজ্ঞের সহজ চিত্রায়ণ ঘটলেও নারীদের প্রতি যৌন নিপীড়নের বর্ণনা প্রকাশে তিনি ছিলেন কুণ্ঠিত। যেখানে শওকত ওসমানের (১৯১৭-১৯৯৮) *নেকড়ে অরণ্য* (১৯৯৩) উপন্যাসে ধর্ষণদৃশ্যে 'নিম্নাঙ্গ পরিষ্কার দেখা যায়। এখনো কি সুগঠিত উরু। ক্যাপ্টেনের লোভ হয়।'[২৩] বা 'সে সুগঠিত নিতম্বের প্রতি এমনই মোহাবিষ্ট যে সম্মুখের দিকে ফিরেও তাকায় না'[২৪] এমন বর্ণনা পাওয়া যায়, সেখানে হুমায়ূন আহমেদের **১৯৭১** (১৯৮৬) নামক উপন্যাসে ধর্ষণের বর্ণনা : 'সে খুবই সহজ ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে বার বছরের মেয়েটির বুকে হাত রাখল।'[২৫] এমন সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছাড়া পাকিস্তানি মিলিটারি বাহিনীর দ্বারা ধর্ষিত হওয়ার বাস্তবিক প্রকাশ দেখা যায় না।

১৯৭১ এর ক্রান্তিকালে বাস্তুহারা হয়েছে অনেক মানুষ। কেউ নিশ্চিহ্ন হয়েছে যুদ্ধের ডামাডোলে আবার কারো আশ্রয় জুটেছে শরণার্থী শিবিরে। *জোছনা ও জননীর গল্প* উপন্যাসের আসমানী তার শিশুকন্যা রুনুকে নিয়ে ঢাকা ছেড়ে গ্রামের অচেনা মানুষের বাড়িতে আশ্রয় খোঁজে, কিন্তু সেখানে অনুকূল আশ্রয় না পেয়ে যুদ্ধসময়ের অগণিত মানুষের মতো নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পৌঁছায় পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের শরণার্থীশিবিরে। একজন আন্তর্জাতিক সাংবাদিকের মতে, 'আনুমানিক সংখ্যার ধারণায় এক কোটিরও বেশি মানুষ প্রাণরক্ষার জন্য পাকিস্তানের সীমানা অতিক্রম করে ভারতীয় সীমান্তে প্রবেশ করেছে।'[২৬] যেহেতু শরণার্থীশিবিরে অধিকাংশই দরিদ্র শ্রেণির, সুতরাং সেখানে শ্রেণিভেদ বিচার করার কোনো অবকাশ ছিল না। তবে অনেক মধ্যবিত্ত এমনকি উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষকে তাৎক্ষণিক আশ্রয়ের সন্ধানে শরণার্থীশিবিরের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে:

> মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরও গভীর সামাজিক চরিত্র অর্জন করে। প্রথমত, মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ধনী-নির্ধনকে এক কাতারে দাঁড় করায়। শরণার্থী শিবির, কিংবা মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ শিবিরে ধনী নির্ধন কোনো পার্থক্য ছিল না।[২৭]

হুমায়ূন আহমেদের *জোছনা ও জননীর গল্প* উপন্যাস থেকে আসমানী ও তার মেয়ে রুনুর শরণার্থীশিবিরে থাকার বর্ণনা:

> মেয়েটা ভিখিরি স্বভাবের হয়ে গেছে। যেখানে সেখানে হাত পাতছে। রুনিকে অবশ্যি দোষ দেয়া যায় না। তারা তো এখন ভিখিরি। নিজ দেশ ছেড়ে অন্য এক দেশে ভিখিরি সেজে বাস করছে। থালা হাতে খাবারের জন্যে দু'বেলা লাইন ধরতে হচ্ছে। কী লজ্জা কী লজ্জা![২৮]

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে একতরফা পাকিস্তানিদের উপর্যুপরি আক্রমণ চললেও 'জনগণের ইচ্ছার ওপর সামরিক দমন-পীড়নের প্রত্যুত্তরে জনগণের পক্ষ থেকেও আসে সশস্ত্র প্রতিরোধ।'[২৯] ভারতের সীমান্তবর্তী ক্যাম্পগুলো থেকে ট্রেনিং নিয়ে বাংলাদেশকে হানাদারমুক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল তরুণ এক শ্রেণির যোদ্ধা। তাদেরকে বলা হতো গেরিলা। শহীদ জননী হিসেবে খ্যাত জাহানারা ইমামের (১৯২৯-১৯৯৪) পুত্র গেরিলাযোদ্ধা রুমীর সঙ্গে *জোছনা ও জননীর গল্প* উপন্যাসের মেধাবী ছাত্র নাইমুলের সাদৃশ্য রয়েছে। তারা বিশ্বের সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্কলারশিপে যাওয়ার সম্ভাবনাকে পাশ কাটিয়ে রেখে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্ভাবনাকে মেনে নিয়ে গেরিলাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। হুমায়ূন আহমেদের *শ্যামল ছায়া* উপন্যাসের জাফর, আনিস, হুমায়ূন আহমেদ, হাসান আলি, মজিদ গেরিলাযোদ্ধা। *আগুনের পরশমণি* উপন্যাসের বদিউল

আলম দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য গেরিলা অপারেশনে নামে। উপন্যাসের বিবরণ থেকে ঢাকায় গেরিলা আক্রমণের বর্ণনা:

> গাড়ি যাচ্ছে ইন্টারকনের দিকে। এই প্রোগ্রামটিতে কোনো ঝামেলা নেই। কেউ গাড়ি থেকে নামবে না। ছুটে যেতে-যেতে কয়েকটি গ্রেনেড ছোঁড়া হবে। হোটেলের বিদেশী সাংবাদিকরা জানবে, ঢাকার অবস্থা স্বাভাবিক নয়।[৩০]

যুদ্ধ-সময়ে বন্দী মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর অমানবিক নির্যাতন প্রসঙ্গ ইতিহাস-স্বীকৃত। গেরিলাযুদ্ধ শিক্ষিত তরুণ মানুষের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছে বলে গেরিলাদের প্রতি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পাশবিকতার কোনো সীমা ছিল না। জীবিত গেরিলাদের কারও শত্রুপক্ষের হাতে ধৃত হওয়া ছিল নরকে পৌঁছে যাওয়ার নামান্তর। *আগুনের পরশমণি* উপন্যাসে গেরিলাযোদ্ধা আশফাককে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ধরে আনার পর তার সহযোগী যোদ্ধাদের খোঁজ বের করার জন্য তার ওপর যে নির্যাতন চালানো হয়, তার বর্ণনা:

> লোকটি পেনসিলের মতো সাইজের একটি কাঠি আশফাকের দু' আঙুলের ফাঁকে রাখল। [...] লোকটি তার হাত নিয়ে খেলা করছে। আশফাক নিজেই বুঝতে পারল না যে সে পশুর মতো আঁ–আঁ করে চিৎকার করছে। [...] ' কিছুই বলবে না?'
>
> 'না।'
>
> 'মাত্র দুটো আঙুল তোমার ভাঙা হয়েছে। তোমার হাতে আরও আটটি আঙুল আছে।'[৩১]

যেকোনো দেশের ক্রান্তিকালে এক শ্রেণির মানুষকে যেমন পাওয়া যায় দেশ রক্ষার পক্ষশক্তি হিসেবে তেমনি আরেক শ্রেণিকে পাওয়া যায় সুবিধাপুষ্ট বিরুদ্ধ শক্তি হিসেবে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানিদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যে ষড়যন্ত্র করেছিল, সেখানে রাজাকার, আলবদর, আলশামস ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের মিত্রশক্তি। তারা যুদ্ধকালে পাকিস্তানপন্থিদের আক্রমণের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে সহযোগিতা করেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এই বিশ্বাসঘাতকতাকেই পেশা হিসেবে নিয়েছে। হুমায়ূন আহমেদের *জোছনা ও জননীর গল্প* উপন্যাসের কলিমুল্লাহ এমন একটি চরিত্র। উপন্যাসে কলিমুল্লাহর সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বুদ্ধিজীবী ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের হত্যার ঘটনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য:

> কলিমউল্লাহ বলল, স্যার এখন খেতে পারব না। আপনার কাছে আমি একটা অতি জরুরি কাজে এসেছি। [...] মিলিটারির এক কর্নেল আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। [...] ধীরেন্দ্রনাথ রায় গাড়িতে উঠে দেখলেন, গাড়িভর্তি মানুষ। [...] বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা গাড়িতে বসে ছিলেন। তাদের নিয়ে যাওয়া হবে বধ্যভূমিতে।[৩২]

শুরু থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রধান শত্রু ছিল পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। ফলে ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে এবং যুদ্ধের একবারে শেষ মুহূর্তে ১৪ ডিসেম্বর 'আল-বদর বাহিনী'র সহায়তায় তালিকা তৈরি করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থানকারী অথবা একেবারেই নিরপেক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ডাক্তার, সাংবাদিকসহ বুদ্ধিজীবীদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। তাদের এ হত্যার উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত ঘৃণ্য। দেশ স্বাধীন হলেও পূর্ব বাংলার মানুষ যেন কখনও শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতিতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, এই ছিল তাদের অভিপ্রায়।

অবশেষে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে বাংলাদেশ লাভ করে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। এ সময়পর্বের ক্রান্তি উপস্থাপনে হুমায়ূন আহমেদ একদিকে যেমন সম্মুখ যুদ্ধ ও যুদ্ধের বাইরের বৈচিত্র্যময় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ শক্তির ভূমিকা স্পষ্টরূপে চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছেন অন্যদিকে তেমনি অন্তস্থ মানুষের বেদনাদীর্ণ অনুভূতির রূপায়ণেও নিরপেক্ষতা দেখাতে পেরেছেন।

স্বাধীনতা-উত্তর ক্রান্তি: স্বপ্নভঙ্গের রাজনীতি

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে মানুষের নিরবলম্বন ও নিঃসঙ্গ অবস্থার প্রান্তে পৌঁছানোর অন্তরালে রয়েছে দীর্ঘ জটিল রাজনৈতিক ক্রান্তির ইতিহাস। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনের ফল অনুযায়ী নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে ১৯৭২ সালে নতুন রাষ্ট্রের সরকার গঠিত হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের অর্থনৈতিক স্থিতি, বিচার ও প্রশাসনব্যবস্থার পুনর্গঠন ও যোগাযোগব্যবস্থার অবকাঠামোগত সংকট মোকাবিলা সে সময়ের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। এর মধ্যে বাংলাদেশে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি নির্ধারিত হয় 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা—যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।'[৩৩] কিন্তু সংবিধান প্রণীত হওয়ার পরও যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে সমাজতন্ত্র আর গণতন্ত্রের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। ফলে সামাজিক সাম্যর প্রশ্নে এদেশের জনগণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান শক্তিগুলোর মতাদর্শে সৃষ্টি হয় নানারূপ বিভক্তি।

> সাধারণ বহিঃশত্রুর অনুপস্থিতিতে দ্বন্দ্ব শুরু হল আওয়ামী লীগের ঘরের ভেতরেই। বিরোধটা ততটা আদর্শগত ছিল না যতটা ছিল ক্ষমতার অংশ পাওয়া না-পাওয়ার। এরা সকলেই মুজিবের লোক, কিন্তু মুজিব নিজে কার লোক প্রশ্ন দাঁড়িয়েছিল সেটাই।[৩৪]

এছাড়া একাত্তরে পরাজিত শক্তি ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের পক্ষবিস্তার বাঙালি জাতির যুদ্ধোত্তর সময়ের পরিস্থিতিকে আরও সংকটাপন্ন করে তোলে। নব্য স্বাধীন দেশের অস্থির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও প্রশাসনব্যবস্থার বিপন্ন অবস্থায় কিছু বিভ্রান্ত মানুষের মধ্যে মূল্যবোধের অবনয়ন ঘটে। পাকিস্তানি হানাদারদের রেখে যাওয়া ও মুক্তিযোদ্ধাদের অসমর্পিত আগ্নেয়াস্ত্রকে ব্যবহার করে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে কেউ কেউ, যার ফলে প্রশ্নবিদ্ধ হয় স্বাধীনতাযুদ্ধের পক্ষশক্তি।

হুমায়ূন আহমেদের *দেয়াল* উপন্যাসে ভিকারুন্নিসা কলেজের ইন্টারমিডিয়েট পড়া শিক্ষার্থী অবন্তির ষোলোতম জন্মদিনে কোনো নিমন্ত্রিত অতিথি আসতে পারে না। এই না আসার কারণ ঔপন্যাসিক অবন্তির দাদা সরফরাজ খানের ভাষায় বলেন: 'দিনদুপুরেই ডাকাতি-ছিনতাই হচ্ছে। যাদের হাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কথা, তাদের কেউ কেউ ডাকাতি-ছিনতাইয়ে নেমেছে।'[৩৫]

যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের ইতিহাস ছিল বহুবিভক্ত রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে ভারাক্রান্ত। ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের রাজনীতির নতুন মেরুকরণ, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধে রাজনৈতিক অঙ্গন ছিল অস্থির। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ ও এর সহযোগী সংগঠন গণবাহিনীও গড়ে ওঠে।[৩৬] এর সঙ্গে যুক্ত হয় শেখ মুজিবসমর্থিত রক্ষীবাহিনীর সংকট। শুরুর দিকে দেশ পুনর্গঠনে রক্ষীবাহিনী বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও একদিকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ন্যায় জলপাই রঙের পোশাক এবং বাহিনী গঠন ও প্রশিক্ষণে ভারতের সহায়তা

জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে অন্যদিকে তাদের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, লুটপাট, ভয়-ভীতি দেখিয়ে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ, গুম, অস্ত্রবাজী, ধর্ষণ, নিয়ন্ত্রণহীন যথেচ্ছ ক্ষমতার ব্যবহার ও জবাবদিহিতার অভাব খুব শীঘ্রই তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অনেক হিন্দু বাড়িঘর ফেলে ভারতে চলে যাওয়ায় তাদের বেনামি সম্পত্তি স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়। কিন্তু বণ্টনকৃত বাড়িগুলো যাদের পাওয়ার কথা তারা না পেয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার ছত্রছায়ায় একধরনের সুবিধাভোগীরা ভোগ করতে শুরু করে। হুমায়ূন আহমেদের *দেয়াল* উপন্যাসে দেখা যায় সরফরাজ খানের গ্রামের বাড়িঘর 'মুজিব সেন্টার' খোলার নামে দখলে নিয়ে নেয় রক্ষীবাহিনীর সদস্য ছানু। এ উপন্যাস থেকেই হুমায়ূন আহমেদের ব্যক্তিগত জীবনাভিজ্ঞতায় রক্ষীবাহিনীর নির্মমতার প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখযোগ্য।

> এক রাতে রক্ষীবাহিনী এসে বাড়ি ঘেরাও করল। তাদের দাবি এই বাড়ি তাদের বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তা এখানে থাকবেন। মা শহীদ পরিবার হিসেবে বাড়ি বরাদ্দ পাওয়ার চিঠি দেখালেন। সেই চিঠি তারা মায়ের মুখের ওপর ছুড়ে ফেলল। এরপর শুরু হলো তাণ্ডব। লেপ-তোষক, বইপত্র, রান্নার হাঁড়িকুড়ি তারা রাস্তায় ছুড়ে ফেলতে শুরু করল। রক্ষীবাহিনীর একজন এসে মায়ের মাথার ওপর রাইফেল তাক করে বলল, 'এই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে বের হন, নয়তো গুলি করব।' মা বললেন, 'গুলি করতে চাইলে গুলি করুন। আমি বাড়ি ছাড়ব না। এত রাতে আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে কোথায় যাব?' আমার ছোটভাই জাফর ইকবাল তখন মায়ের হাত ধরে তাঁকে রাস্তায় নিয়ে এল। কী আশ্চর্য দৃশ্য! রাস্তার নর্দমার পাশে অভুক্ত একটি পরিবার বসে আছে। সেই রাতেই রক্ষীবাহিনীর একজন সুবেদার মেজর ওই বাড়ির একতলায় দাখিল হলেন।[৩৭]

একদিকে রক্ষীবাহিনী জনগণের নিকট দলীয় রাজনীতি প্রভাবিত একটি বাহিনী বলে প্রতীয়মান হয়, অন্যদিকে শেখ মুজিবের রাষ্ট্রপতি শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের অভিপ্রায় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে করে। ফলে দেশের মধ্যে গৃহযুদ্ধ, রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। এরূপ পরিস্থিতিতে সশস্ত্র উপদলের তৎপরতা রোধে শেখ মুজিবুর রহমান 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন করা ছাড়া কোনো বিকল্প উপায় খুঁজে পাননি। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে সাধারণ জনগণ 'শেখ মুজিবের একক ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণে বেসামরিক আমলাতন্ত্র এবং সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে থাকে।'[৩৮] পরিপ্রেক্ষিতে সেনাবাহিনীর কিছুসংখ্যক প্রতিবিপ্লবী সামরিক অফিসারদের হাতে শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে প্রাণ হারান। শেখ মুজিবকে হত্যার পরপরই 'মন্ত্রিসভায় পূর্ববর্তী মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের একাংশকে পুনর্বহাল করে খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।'[৩৯] এই ক্ষমতারোহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে দীর্ঘ সময়ের জন্য অভ্যুত্থান, হত্যা ও ধ্বংসের ধারাবাহিক অধ্যায়ের সূচনা হয়। *দেয়াল* উপন্যাসে জাতীয় চার নেতার হত্যাযজ্ঞ বর্ণনা:

> মুসলেহ উদ্দিনের বন্দুকের মুখে আইজি প্রিজন দলবল নিয়ে এক নম্বর সেলে গেলেন। সেখানে তাজউদ্দীন এবং নজরুল ইসলাম ছিলেন। দুই নম্বর সেলে ছিলেন মনসুর আলী এবং কামারুজ্জামান। এই দু'জনকে এক নম্বর সেলে আনা হলো। রিসালদার মুসলেহ উদ্দিন খুব কাছ থেকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলিতে চারজনকে হত্যা করে। তাজউদ্দীন ছাড়া বাকি তিনজন তাৎক্ষণিকভাবে মারা যান। তাজউদ্দীনের হাঁটুতে ও পেটে গুলি লেগেছিল। তিনি 'পানি পানি' বলে কাঁতরাচ্ছিলেন। তাঁকে পানি দেওয়ার মতো পরিবেশ ছিল না। মুসলেহ উদ্দিন চলে যাওয়ার

> পর আরেকটি ঘাতক দল আসে। এই দলের প্রধান নায়েক আলী। তাকে মৃত চার নেতাকে দেখানো হয়। নায়েক আলি মৃত শবের ওপরে বেয়োনেট চার্জ করে।[৪০]

৭৫'পরবর্তী সময় থেকে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতায় অধিষ্ঠান ও মৌলবাদী সংস্কৃতির পুনরুত্থানে বিস্ময়করভাবে মানুষের নৈতিক অবনতি ঘটে। পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা প্রাপ্তির কিছু কাল পরেই মুক্তিযুদ্ধবিরোধী জাতীয়-আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীসমূহের তৎপরতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রে স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থানকারী শক্তির সহজ উপস্থিতি শুরু হয়। এ বিষয়ে গোলাম মুরশিদের অভিমত, 'জিয়াউর রহমান এঁদের ব্যাপক হারে পুনর্বাসন করলেও, পুনর্বাসনের কাজ মুজিবের আমল হতেই শুরু হয়েছিল।'[৪১] রাষ্ট্রের শরীরকাঠামোয় সেনাতন্ত্র ও ধর্মান্ধতার পুনরুজ্জীবনে মুক্তিযুদ্ধের শুভচেতনার অপসৃত রূপ হুমায়ূন আহমেদের শিল্পচৈতন্যকে গভীরভাবে আহত করে। তাঁর সে মর্মাহত রূপ তাঁর রচিত বিভিন্ন উপন্যাসে পরিস্ফুট হয়েছে। *বহুব্রীহি* (১৯৯০) উপন্যাসে ঢাকায় বসবাস করা একটি সংবেদনশীল পরিবার রাজাকারদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না বলে পাঁচটা টিয়াপাখি কিনে তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে 'তুই রাজাকার' বুলি শেখানোর পরিকল্পনার করে।

> এইসব টিয়া পুরোপুরি কথা শিখে গেলে এদের উপহার হিসেবে বিশেষ বিশেষ মানুষদের কাছে পাঠানো হবে। তাঁরাই পাবেন যারা এক সময় রাজাকার ছিলেন; আজ দেশের হর্তাকর্তাদের একজন হয়ে বসে আছেন।[৪২]

সমালোচক মোহাম্মদ আজম মনে করেন 'রাজাকার পুনর্বাসন, তাদের বিচার না হওয়া, ক্ষেত্রবিশেষে পদকপ্রাপ্তি বা হর্তাকর্তা হয়ে ওঠার প্রতি হুমায়ূন আহমেদের এমন ক্ষোভ তাঁর ব্যক্তিজীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতাপ্রসূত অনেকটা।[৪৩]

স্বাধীনতা লাভের কিছুকাল পরেই শুধু স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির পুনরুত্থানই নয়, বরং রাষ্ট্রযন্ত্র বিকলের সর্বাঙ্গীণ আয়োজন রাষ্ট্রক্ষমতার মধ্য থেকেই সম্পন্ন হতে শুরু হয়। 'পুরো ৮০ দশক জুড়ে একদিকে সামরিকীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ, ধর্মের বাণিজ্যিকীকরণ, লুম্পেনীকরণ ও নিপীড়ন ব্যাপকতা লাভ করে।'[৪৪] রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও দেখা যায় অরাজক পরিস্থিতি। সরকারের পৃষ্ঠপোষক বাহিনী দ্বারা ক্ষমতা পরিচালিত হতে থাকে বলে তরুণদের মধ্যে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সৃষ্টি হয় হীনম্মন্যতা। সম্ভাবনাশূন্য ভবিষ্যতের আশঙ্কায় বর্তমানের নিরর্থক জীবন অতিবাহিত করেই তারা তৃপ্ত হয়। সময়ের সে বিপন্ন পরিস্থিতিকে হুমায়ূন আহমেদ তাঁর শিল্পসত্তায় ধারণ করেছেন। তাঁর *রজনী* উপন্যাসে বীরু-মাসুমদের জীবন নিয়ে কোনো পরিকল্পনা নেই, নেই কোনো উচ্ছ্বাস। তারা স্যামুয়েল বেকেটের (১৯০৬–১৯৮৯) *ওয়েটিং ফর গোডো* (১৯৫৩) উপন্যাসের ভ্লাদিমির আর এস্ট্রাগনের মতো নিরাসক্ত চোখে এরশাদ-বিরোধী স্বৈরাচার পতনের আন্দোলন পর্যবেক্ষণ করে: 'একটা মিছিল যাচ্ছে। নির্জীব ধরনের মিছিল। কোনোরকম উৎসাহ উত্তেজনা নেই। কার চামড়া যেন তুলে নিতে চাচ্ছে, কিন্তু এমনভাবে বলছে যেন চামড়া তুলে নেওয়াটা একটা আরামদায়ক ব্যাপার।'[৪৫] পরীক্ষার তারিখ দিলে তারা উত্তেজনা বোধ করে না, বরং ভাবে : 'পাশ করে করবেটা কী? বেকার থাকার চেয়ে ছাত্র থাকাই ভাল না? কতরকম ফেসিলিটি।'[৪৬]

নব্বইয়ের দশক থেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতন্ত্রের শাসন ব্যবস্থার চর্চা শুরু হয়। কিন্তু ১৯৯১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচিত তিনটি গণতান্ত্রিক সরকার

ক্ষমতায় এলেও দলের ভেতরে-বাইরে গণতান্ত্রিক চর্চার ধারা ও ঐতিহ্য এ দেশে গড়ে ওঠেনি। ফলে প্রতিটি সরকারের সময়েই রাষ্ট্রনেতাগণ পেশিশক্তি প্রদর্শন করে ক্ষমতায় টিকে থাকার দুর্দমনীয় ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ সময়ে বাংলাদেশের প্রধান দুটি দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে দেশে বহুবার অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। হরতাল, মিছিল, মারামারি, বোমাবাজি, জ্বালাও-পোড়াও কর্মসূচিতে আপামর জনসাধারণের জীবন হয়েছে দুর্বিষহ। হুমায়ূন আহমেদের *চৈত্রের দ্বিতীয় দিবস* (১৯৯৮) উপন্যাসে দেখা যায়, হরতালে জঙ্গি তৎপরতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের বিপর্যস্ত অবস্থা :

> গেট পর্যন্ত যাবার আগেই হঠাৎ করেই ভয়াবহ ঝামেলা শুরু হয়ে গেল। নিউমার্কেটের দিক থেকে চোখের নিমিষে একটা জঙ্গি মিছিল চলে এল, বিকট শব্দে কয়েকটা বোমা পড়ল। গাড়ির কাঁচ ভাঙাভাঙি শুরু হয়ে গেল। মিছিলের লোকজনের হাতে বড় বড় বাঁশ অনেকের হাতে কেরোসিনের টিন। গাড়ি ভেঙে গাড়িতে আগুন দেবার ব্যবস্থা। [...] একটা বাস পুড়ছে। বাস ভর্তি লোকজন। বাস থেকে তারা লাফিয়ে নামার চেষ্টা করছে।[৪৭]

রাজনীতির সঙ্গে এমন দ্বৈরথ সম্পর্কে ক্লান্ত মানুষের প্রতিবাদ ও উত্তরণ-আকাঙ্ক্ষাও চিত্রায়িত হয়েছে হুমায়ূন আহমেদের *হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম* উপন্যাসে। হিমুর ফুফাতো ভাই বাদলের মধ্যে হরতাল বন্ধের প্রচেষ্টা হিসেবে জিরোপয়েন্টে গিয়ে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ দৃশ্যমান। বাদল মনে করে আত্মাহুতির সংবাদ পত্রপত্রিকায় ছাপা হলে রাজনীতিকেরা একটা ধাক্কা খাবেন। তারা বুঝবেন পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে। তারা তখন আলোচনায় বসবেন। কিন্তু হিমুর ফুফা তিক্ত গলায় বললেন : 'দুই নেত্রীর বোঝার হলে আগেই বুঝত। এই পর্যন্ত তো মানুষ কম মরেনি! তুই তো প্রথম না।'[৪৮]

মূলত, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক টানাপোড়েন, যুদ্ধবিরোধী অপশক্তির উত্থান ও স্বপ্নভঙ্গের প্রেক্ষাপটে হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস সমকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থা, ক্ষমতার দ্বন্দ্বকে প্রশ্ন করে। যার পরিপ্রেক্ষিতে জনমানুষের হতাশা ও আশঙ্কার সাহসী কণ্ঠ বাঙালি অনুভূতিকে নব জাগ্রত চেতনায় জেগে ওঠার সাহস দেয়।

একুশ শতকের ক্রান্তি: ক্ষমতা ভোগের রাজনীতি

একুশ শতক থেকে বাংলাদেশের রাজনীতি পুরোপুরি রাষ্ট্রনেতাদের ইচ্ছানির্ভর পথে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। বর্তমানে 'আইন ও বিচার বিভাগ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সব প্রতিষ্ঠান রাজনীতিকরণের শিকার।'[৪৯] ফলত বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল বর্তমানে নানাপ্রকার স্বেচ্ছাচারে পরিপূর্ণ। রাজনৈতিক ক্ষমতার অপচর্চায় প্রতিবাদের পথ সংকীর্ণ হয়ে ওঠার সাপেক্ষে এখন বিদ্রূপ হচ্ছে মানুষের বিবেক প্রকাশের মাধ্যম। হুমায়ূন আহমেদের হিমু চরিত্রনির্ভর অধিকাংশ উপন্যাসেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনার সূত্র ধরে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা পুলিশ ও র‍্যাবের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, যেমন ক্রসফায়ার, তদন্তের নামে অহেতুক ভোগান্তি, রিমান্ডের নামে নির্যাতন, যত্রতত্র ঘুষ গ্রহণের বিষয়গুলোকে হুমায়ূন আহমেদ কৌতুকের স্বরে তীব্র সমালোচনায় এনেছেন। *হলুদ হিমু কালো র‍্যাব* উপন্যাসে হিমুর ফুফার রাজনীতি সম্পর্কে, রাষ্টপরিচালক নেতাদের সম্পর্কে, র‍্যাব সম্পর্কে আক্ষেপজাত মনোভাব:

> দেশ পরিচালনার দায়িত্ব র‍্যাবের হাতে দিতে হবে। এই দেশ রাজনীতির উপযুক্ত না। কোনো রাজনীতি এদেশে থাকবে না। যে নেতাই 'প্রিয় ভায়েরা আমার' বলে মুখ খুলবেন তাদেরকেই র‍্যাব ভাইদের হাতে তুলে দেয়া হবে। র‍্যাব তাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।[৫০]

বর্তমানে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার চেয়েও রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা ব্যক্তিদের ভয় পাওয়া ও তাদের তুষ্ট রাখার প্রবণতা স্থায়ী রূপ পেয়েছে। এরূপ রাজনৈতিক পরিস্থিতি, প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও সামাজিক বৈপরীত্যের পরিপ্রেক্ষিতে হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস হয়ে উঠেছে জনমানুষের নিঃশব্দ দীর্ঘশ্বাস, বিক্ষোভ ও ক্ষীণ প্রত্যয়ের প্রতিচ্ছবি। তাঁর *তেতুল বনে জোছনা* উপন্যাসে বিরাটনগরের চেয়ারম্যান জহির খাঁকে নিজের আধিপত্য বজায় রাখতে বিচারের নামে নিরীহ ব্যক্তিদের ওপর অন্যায়ভাবে চড়াও হতে দেখা যায়। কিন্তু তার প্রহসনমূলক দুরভিসন্ধিতে সামাজিকভাবে অপদস্থ হয়ে বিরাটনগরের মসজিদের মাওলানা আত্মহত্যা করার পরও পুলিশ তাকে কিছুই বলে না। কারণ, বিরাটনগরে যোগাযোগমন্ত্রী এলে জহির খাঁ তাকে একটা সোনার ঢেঁকি উপহার দিয়ে মন্ত্রীর মন কিনে নেন। এতে পুলিশ বুঝে যায়, যিনি মন্ত্রীর সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করেন, চা খান, তাকে আত্মহত্যায় প্ররোচনাদানকারী হিসেবে গ্রেপ্তার করা যায় না। মূলত, রাষ্ট্রযন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এরূপ দূষণ, দুর্নীতি ও ক্ষমতার তোষণ রয়েছে বলেই এদশের জনগণ প্রতিকারহীন এক গভীর ক্রান্তিতে ক্রমান্বয়েই আরো বেশি নিমজ্জিত হচ্ছে। রাষ্ট্রের ক্ষমতা কাঠামো ও জনগণের মানসিকতার আমূল পরিবর্তন না হলে এরূপ তমসাবৃত ক্রান্তি এ দেশের মানচিত্র থেকে স্থায়ী বিলোপ কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

পরিশেষে বলা যায়, ক্রান্তিকালীন প্রেক্ষাপটে হুমায়ূন আহমেদের রাজনীতি নির্ভর উপন্যাসসমূহ বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, জনমানুষের হতাশা ও আশঙ্কার এমন এক সাহসী পাঠ; যার মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষের রাজনীতিক প্রতিবেশে বসবাসের দ্বান্দ্বিক অভিজ্ঞতা এবং ইতিহাসের গোপন প্রবাহে আত্মানুসন্ধানের প্রচেষ্টাকে শনাক্ত করা সহজ হয়। হুমায়ূন আহমেদ কেবল একজন সাহিত্যিক নন, বরং এক ধরনের নীরব রাজনৈতিক ইতিহাসবেত্তা বলেই তাঁর রচনায় স্বাধীনতা পূর্ব ও উত্তরকালের সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্তর্গত সংকটগুলো গভীর মমতা ও সূক্ষ্ম অনুভূতিতে প্রকাশ পেয়ে পাঠকের চেতনাকে গভীরভাবে স্পন্দিত করতে সমর্থ হয়েছে। একই সঙ্গে উপন্যাসগুলোর সংবেদন ও মানবিক দৃষ্টি বাংলাদেশের কথাসাহিত্যকে একটি নতুন বিকল্প চিন্তার পরিসরে দাঁড় করায় যা ভবিষ্যত বাংলাদেশের একান্তভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের সংকটকালীন বাস্তবতায় নতুন পথ অন্বেষার প্রেরণা দিবে।

তথ্য-নির্দেশ

১. বিপুল রঞ্জন নাথ, *রাজনৈতিক তত্ত্ব ও সংগঠন*, (ঢাকা: বুক সোসাইটি, ১৯৯৭), পৃ. ০১

২. Robert A. Dahl , *Political Theory,* (Edit : R. C. Agarwal), (New Delhi: S. Chand & Company Ltd, 2006), p. 02

৩. জয়া চ্যাটার্জি, *বাঙলা ভাগ হল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ-বিভাগ* ১৯৩২-১৯৪৭, (অনুবাদক: আবু জাফর), (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৯), পৃ: ২৪

৪. জন আর. ম্যাকলেন, 'বঙ্গবিভাগ (১৯০৫): হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক', *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, প্রথম খণ্ড, (সম্পাদক: সিরাজুল ইসলাম), (কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৩), পৃ. ১৫৬

৫. হুমায়ূন আহমেদ, *মধ্যাহ্ন*, (ঢাকা : অন্যপ্রকাশ, ২০০৮), পৃ. ১২৬

৬. শহীদুল্লা কায়সার, *সংশপ্তক*, (ঢাকা: জোনাকী প্রকাশনী, ২০০০), পৃ. ১২৪

৭. কে আলি (১৯৭০), *বাংলাদেশ ও পাক ভারতের ইতিহাস প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক যুগ*, (ঢাকা: আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭), পৃ. ১৬৮

৮. আহমদ শরীফ, *সংকট: জীবনে ও মননে*, (ঢাকা: বিদ্যাপ্রকাশ, ১৯৯৩), পৃ. ৬৮

৯. হুমায়ূন আহমেদ, *মাতাল হাওয়া*, (ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০১৩), পৃ. ৮৫

১০. তদেব, পৃ. ৩৩

১১. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *চিলেকোঠার সেপাই*, (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৯), পৃ. ৫৭

১২. অনিল মুখার্জী, *স্বাধীন বাংলাদেশ সংগ্রামের পটভূমি*, (ঢাকা: দ্যু প্রকাশন, ২০২১), পৃ. ৮০

১৩. হুমায়ূন আহমেদ, *মাতাল হাওয়া*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬

১৪. হুমায়ূন আহমেদ, *জোছনা ও জননীর গল্প*, (ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০১০), পৃ. ১৩৮

১৫. তদেব, পৃ. ১৮২

১৬. নাজনীন সুলতানা নিনা, *একাত্তরের ডায়েরি*, (ঢাকা : দ্যু প্রকাশন, ২০২১), পৃ. ১২

১৭. হুমায়ূন আহমেদ, *আগুনের পরশমণি*, (ঢাকা: অনন্যা, ২০১০), পৃ. ২৫১

১৮. আয়েশা ফয়েজ, 'সোনার পুতলা', *হুমায়ূন আহমেদ স্মারকগ্রন্থ*, (সম্পাদক: আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য), (ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০১২), পৃ. ১২

১৯. হুমায়ূন আহমেদ, *শ্যামল ছায়া*, (ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৬), পৃ. ২৬০

২০. স্বদেশ রায়, 'মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস : আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের ক্যামেরার ছবি', *হুমায়ূন আহমেদ সমকালের চোখে*, (সম্পাদক: হাসান হাফিজ), (ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৫), পৃ. ৮৩

২১. অ্যান্থনি মাসকারেনহাস, *গণহত্যা*, (অনুবাদক: সুবীর বৈরাগী), (ঢাকা: দ্যু প্রকাশন, ২০২১), পৃ. ১৪

২২. হুমায়ূন আহমেদ, *অনিল বাগচীর একদিন*, (ঢাকা : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০১২), পৃ. ৩৮১

২৩. শওকত ওসমান, *নেকড়ে অরণ্য*, (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৫৩

২৪. তদেব, পৃ. ৩৩

২৫. হুমায়ূন আহমেদ, *১৯৭১*, (ঢাকা : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০১০), পৃ. ৩৮

২৬. স্পার্তাক বেগলভ, 'ভারতীয় উপমহাদেশ বিয়োগান্ত নাটকের তৃতীয় অঙ্ক', *বাংলাদেশের সংগ্রাম ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা*, (অনুবাদক: ভি টি কোলবেৎস্কি), (ঢাকা: দ্যু প্রকাশন, ২০২২), পৃ. ৮০

২৭. নজরুল ইসলাম, *আগামীদিনের বাংলাদেশ ও জাসদের রাজনীতি*, (ঢাকা: অনন্যা, ২০১৩), পৃ. ২৬

২৮. হুমায়ূন আহমেদ, *জোছনা ও জননীর গল্প*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৭

২৯. ভি শুরিগিন, 'ভারত উপমহাদেশে শান্তির জন্য', *বাংলাদেশের সংগ্রাম ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা*, (সম্পাদক: ভি টি কোলবেৎস্কি), (ঢাকা: দ্যু প্রকাশন, ২০২২), পৃ. ১২২

৩০. হুমায়ূন আহমেদ, *আগুনের পরশমণি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬

৩১ তদেব, পৃ. ২৮২-২৮৩

৩২. হুমায়ূন আহমেদ, *জোছনা ও জননীর গল্প*, (ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০১০), পৃ. ৪৯২

৩৩. কামাল হোসেন ও অন্যান্য, 'প্রস্তাবনা' *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান* (১৯৭২), পৃ.

৩৪. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *বাঙালির জাতীয়তাবাদ*, (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৭), পৃ. ২৫৪

৩৫. হুমায়ূন আহমেদ, *দেয়াল*, (ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০১৩), পৃ. ১৫

৩৬. মহিউদ্দিন আহমদ, *জাসদের উত্থান পতন: অস্থির সময়ের রাজনীতি*, (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪), পৃ. ১৩৪

৩৭. হুমায়ূন আহমেদ, *দেয়াল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪

৩৮. বদরুদ্দীন উমর, *সামরিক শাসন ও বাংলাদেশের রাজনীতি*, (ঢাকা: প্রতীক প্রকাশন, ১৯৮৯), পৃ. ২৪১

৩৯. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি* ১৯৭১-২০১১, (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৩), পৃ.৪১

৪০. হুমায়ূন আহমেদ, *দেয়াল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩-১৩৪

৪১. গোলাম মুরশিদ, *মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর একটি নির্দলীয় ইতিহাস*, (ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন, ২০১৭), পৃ. ২০০

৪২. হুমায়ূন আহমেদ, *বহুব্রীহি*, (ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৭), পৃ. ৩৭৯

৪৩. মোহাম্মদ আজম, *হুমায়ূন আহমেদ পাঠপদ্ধতি ও তাৎপর্য*, (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০২০), পৃ. ১৬১

৪৪. আনু মুহাম্মদ, *রাষ্ট্র ও রাজনীতি : বাংলাদেশের দুই দশক*, (ঢাকা: সন্দেশ, ২০১৬), পৃ. ভূমিকা

৪৫. হুমায়ূন আহমেদ, *রজনী*, (ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৭), পৃ. ৩৬৪

৪৬. তদেব, পৃ. ৩৬৪

৪৭. হুমায়ূন আহমেদ, *চৈত্রের দ্বিতীয় দিবস*, (ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৫) পৃ.৩৬৮

৪৮. হুমায়ূন আহমেদ, *হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম*, (ঢাকা: অনন্যা, ২০১২), পৃ. ৪২০

৪৯. মোহাম্মদ সাজ্জাদুল ইসলাম, 'ঠাট্টার সংস্কৃতি, ঠাট্টার রাজনীতি', *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ভাষা-সাহিত্যপত্র*, দ্বাচত্বারিংশৎ সংখ্যা, (বাংলা বিভাগ: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৬), পৃ. ১৫৯

৫০. হুমায়ূন আহমেদ, 'হলুদ হিমু কালো র‍্যাব', *হিমু সমগ্র* (ঢাকা: অনন্যা, ২০১২), পৃ. ১১১২